সর্বপল্লী

রাধাকৃষ্ণান

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

কথামুখ

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান ছিলেন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। তাঁর জন্মদিন ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস রূপেও পালিত হয়। আসলে রাষ্ট্রনায়ক নন, শিক্ষক এবং দার্শনিক হিসেবেই সারা বিশ্বে তাঁর পরিচিতি। তিনি ছিলেন জ্ঞানতাপস। আজীবন পড়াশোনা এবং লেখার কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন তিনি। ধর্ম ও দর্শনের গূঢ়তত্ত্বগুলিকে সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করে তিনি শুধু এদেশ নয়, সারা বিশ্বে এক অপূর্ব চেতনার বিকাশ ঘটান। মানবদরদি মরমিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণানের অনাড়ম্বর জীবন এবং আন্তরিক ব্যবহার স্পর্শ করে পৃথিবীর যে-কোনো মানুষের হৃদয়। সে কারণেই স্তালিনের মতো লৌহমানবও তাঁর স্পর্শে অভিভূত হন। সারা বিশ্বের এই অনন্য শিক্ষক এবং দার্শনিকের জীবন চরিত শুধু আজকের প্রজন্ম নয়, সব প্রজন্মের মানুষের পথের দিশা হয়ে উঠতে পারে।

সেকারণেই মূলত তাঁরই লেখাকে ভিত্তি করে লেখা হয়েছে এই বইটি।

প্রসঙ্গত, এই ধরনের বই প্রকাশের জন্য শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়ক যে কর্মসূচি নিয়েছেন তারই সূত্রে এটি লেখা। তাই অবশ্যই কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। সেই সঙ্গে বইটি যাঁদের জন্য লেখা—সেই পাঠক পাঠিকাদের ভালো লাগলেই সার্থক হবে পরিশ্রম।

অলমিতি—

নন্দলাল ভট্টাচার্য।

২৫ নভেম্বর, ২০০২

সূচিপত্র

- ❑ রাধাকৃষ্ণান : আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পটভূমি ১১
- ❑ রাধাকৃষ্ণানের বাবা, মা ও পরিবার ১৯
- ❑ ছেলেবেলা ও লেখাপড়া ২৪
- ❑ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন ৩৭
- ❑ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণান ৪৪
- ❑ দর্শন নিয়ে লেখালেখি—ভাষণ দেশ বিদেশে ৫৯
- ❑ রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণান ৮৪
- ❑ রাধাকৃষ্ণানের দৃষ্টিতে দর্শন ৮৭
- ❑ রাধাকৃষ্ণানের দৃষ্টিতে ধর্ম ৮৯
- ❑ রাধাকৃষ্ণান ও বিবেকানন্দ ৯১
- ❑ গান্ধিজি ও রাধাকৃষ্ণান ৯৫
- ❑ রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণান ৯৯
- ❑ জওহরলাল ও রাধাকৃষ্ণান ১০৪
- ❑ শ্যামাপ্রসাদ ও রাধাকৃষ্ণান ১০৮
- ❑ স্তালিন ও রাধাকৃষ্ণান ১১০
- ❑ মার্কস ও রাধাকৃষ্ণান ১১২
- ❑ রাধাকৃষ্ণানের সংসার জীবন ১১৪
- ❑ রাধাকৃষ্ণানের জীবনপঞ্জি ১১৭

রাধাকৃষ্ণান : আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পটভূমি

ভারতে ইংরেজরা এসেছিল ব্যাবসা করতে। হয়ে গেল রাজা। শাসন এবং শোষণের একচেটিয়া অধিকার পেয়ে খুশি ইংরাজ। অন্য দেশের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে নিজের দেশের দারিদ্র্য দূর করার এমন একটি মহাসুযোগ পেয়ে তারা উল্লসিত। তারও অনেক অনেক বছর আগে তাদের আগমন এখানে ধর্মপ্রচারের লোভেই।

বণিকের মানদণ্ড এবং রাজার রাজদণ্ডের নিরাপদ আশ্রয়ের আড়ালে ধর্মের শ্বেত আলখাল্লা চাপিয়ে এদেশে এসেছিল খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা। মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবার জন্যই তাদের এই আগমন, এমন কথা বারবার বললেও তা ছিল সত্যের বিপরীত রূপ। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করে এদেশের মাটিতে ইংরেজ শাসনের ভিতটি চিরস্থায়ী করা। আর এই কারণেই তাদের প্রধান কাজ ছিল দেশের প্রাণশক্তির মূল শিকড় ছিন্ন করে দেওয়া। তারা বিশ্বাস করত শাসকের রক্তচক্ষু দিয়ে দেশ বা জাতিকে যতদিন পদানত রাখা যায়, তার চেয়ে অনেক সহজেই তাদের বশে রাখা যেতে পারে তাদের

ধর্মান্তরিত করে। প্রজা যদি রাজার ধর্মে দীক্ষিত হয়, তাহলে সে রাজা বা রাজার জাতির সঙ্গে এক ধরনের একাত্মতা বোধ করবে। ওই একাত্মতাই তাদের রাজবিরোধিতা থেকে বিরত রাখবে। এমনকি তারা নিজেরাই রাজশক্তিকে আরও দৃঢ়, আরও শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হবে। আর ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিভিন্ন সময় এদেশে যত ইংরাজ সৈন্য আসে, তাদের থেকে এদেশে আসা ধর্মযাজকদের সংখ্যা কম ছিল না। ইংরেজ শাসকেরা নয়, খ্রিস্টান ধর্মযাজকরাই এদেশে ইংরেজ রাজত্বের ভিত পাকাপোক্ত করতে বেশি সাহায্য করেছিল।

ইতিহাসের সাক্ষ্য, এদেশে ইংরেজরা আসার বহু আগে থেকেই ইউরোপের নানা দেশ থেকে বণিক এবং রাজদূতরা এদেশে আসতে থাকে। বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা, বিশেষ করে ব্যাবসার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের লক্ষ।

ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে পর্তুগিজরাই এদেশে আসার অপেক্ষাকৃত সহজ জলপথের সন্ধান পায়। উত্তমাশা অন্তরীপের আবিষ্কার ইউরোপীয়দের কাছে ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য সম্ভার সহজলভ্য করে তোলে।

বণিক নয়, এদেশে প্রথম এসেছিলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা। ভারতের সনাতন ধর্মের সঙ্গে নবোদ্ভূত খ্রিস্ট ধর্মের কোনো কোনো বিষয়ে সমন্বয় ঘটানোর প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছিলেন। এছাড়া ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করে সমধর্মীয় জনশক্তিতে বলবান হওয়ার সুপ্ত বাসনা ছিল তাঁদের।

খ্রিস্টধর্ম উদ্ভবের অনতিবিলম্বে এদেশে এসেছিলেন যিশুখ্রিস্টেরই অন্যতম প্রধান শিষ্য সেন্ট টমাস বা সাধু থোমো। ৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি এসেছিলেন কেরলে। বলা হয়, স্বয়ং যিশুখ্রিস্টই তাঁকে এদেশে পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাণী প্রচার করার জন্য।

অনেকে বিশ্বাস করেন, শুধু সেন্ট টমাস নন, স্বয়ং যিশুখ্রিস্টই এসেছিলেন ভারতে। তিনি কাশ্মীরের হিমালয় অঞ্চলে সাধনা করেছিলেন এমন কথাও বিশ্বাস করেন তাঁরা। তাঁদের এই মতের সমর্থনে বহু তথ্যও পেশ করেছেন তাঁরা। তবে তাঁদের ওই ধারণা বা সিদ্ধান্ত এখনও তর্কাতীত নয়।

সেন্ট টমাস কেরলে এসে সেখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষকে ধর্মান্তরিত করার কাজে সফল হন। কেরলে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠী বা মণ্ডলী গঠিত হয়।

কেরলের মতোই কন্যাকুমারিকার পূর্বাঞ্চলে তামিল অধিবাসীদের মধ্যেও খ্রিস্টধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতক থেকে। এই প্রভাব বৃদ্ধির মূলে ছিলেন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার। তাঁর চেষ্টাতেই ওই অঞ্চলের বহু মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সময় যাঁরা এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারে মুখ্য ভূমিকা নেন তাঁদের গরিষ্ঠ অংশই ছিলেন পর্তুগিজ। ধর্মযাজক হলেও তাঁরা পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় মনোভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। ফলে এদেশের ধর্মসংস্কৃতি, ঐতিহ্য কোনোটিরই যথার্থ মূল্য তাঁরা অনুধাবন করতে পারতেন না। ফলে তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় জনজাতির একটা মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্বে এমন কিছু ধর্মযাজক এদেশে আসেন যাঁরা প্রাথমিকভাবে বিদেশি বণিক এবং শাসকের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ না রেখেই খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। এঁদেরই অগ্রপথিক রোবের্তো দে নোবিলি দক্ষিণ ভারতের মাদুরা শহরে আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন, সংস্কৃত ও তামিল সাহিত্যচর্চা, ধ্যানচর্চা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তামিল ও তেলেগু জনসাধারণের

মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। তাঁরই পথ অনুসরণ করে আরও বেশ কিছু যাজক একইভাবে ধর্মপ্রচার করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে বারথলমেয় জিগেন্‌বল্‌ক এবং ফ্রেডারিখ সোয়ার্টজ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এদেরই প্রচারের ও সেবাকাজের ফলে তামিল ও তেলেগুভাষী লক্ষ লক্ষ নরনারী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশে খ্রিস্টধর্ম বেশ দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হয়।

খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সেই প্রথম পর্বে খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে এক ধরনের শ্রদ্ধার মনোভাব থেকে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের মেলবন্ধন ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যেহেতু তখনও পর্যন্ত তাঁদের লক্ষ ছিল ধর্মপ্রচার এবং ইউরোপীয় বণিকদের লক্ষ ছিল বাণিজ্য করা। তাই সংঘাতের তেমন বড়ো কোনো ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়নি।

ইংরেজরা ক্রমেই এদেশে অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়। তখন থেকে অবস্থা বদলে যেতে থাকে। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ইউরোপীয়দের মধ্যে ইংরেজরা এদেশে আসেন বহু পরে।

ভারতের সম্পদের কথা জেনে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ইংলন্ডের রানি এলিজাবেথ 'দি গভর্নর অ্যান্ড কোম্পানি অব মার্চেন্টস অব লন্ডন ট্রেডিং ইন টু দি ইস্ট ইন্ডিজ'-কে যে সনদ দেন তাতেই ইংরেজদের ভারতে আসার সম্ভাবনা সূচিত হয়। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গিরের কাছ থেকে ফরমান পেয়ে ইংরেজরা সুরাটে স্থায়ী কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়। ১৬১৫-তে মোগল দরবারে প্রথম রাজদূত হয়ে আসেন স্যার টমাস রো। তিনিই ইংরেজদের জন্য নানা সুযোগসুবিধে আদায় করে নেন। ১৬১৯-এর মধ্যে সুরাট, আগ্রা, আমেদাবাদ এবং ভরুচ-এ ইংরেজ কুঠি গড়ে ওঠে। ১৬১১-তে মসুলিপত্তনমে ইংরেজ কুঠি

স্থাপিত হয়। ১৬৩৯-এ মাদ্রাজপত্তনমে কুঠি স্থাপন করে ইংরেজরা আধুনিক চেন্নাই শহর গড়ার কাজ শুরু করে। তখনও পর্যন্ত কিন্তু বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা আদায়ে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের হঠিয়ে দিয়ে নিজেরা একচেটিয়া বাণিজ্যের সুযোগ নিতে ইংরেজরা ব্যস্ত ছিল।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গাদেশে নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলাকে পলাশির যুদ্ধে পরাজিত করার পর ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পলাশি থেকেই বণিক ইংরেজ শাসক ইংরেজে পরিণত হতে থাকে। আর তখন থেকেই যাজক ইংরেজ আর শুধু ধর্মপ্রচারক না থেকে শাসক ইংরেজের লেজুড় হয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠারও সহায়ক হতে থাকে। তখন থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি প্রীতির পরিবর্তে ভারতীয়দের ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যাপৃত হতে থাকেন তাঁরা। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরেজ রাজপুরুষদের মধ্যে ভারতীয়দের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে।

বাড়ে শক্তি প্রয়োগের ইচ্ছা, অন্যদিকে শাসকবর্গের হাতের মানুষ হিসেবে ব্যবহারে আসে উন্নাসিকতা। প্রীতি নয়, ঘৃণা তখন প্রকট হয়ে ওঠে তাঁদের ব্যবহারে। স্বাভাবিকভাবেই এদেশীয়দের মধ্যেও জাগতে থাকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা ও শক্তির অভাবের ফলে বাড়তে থাকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা। স্বধর্মের মূলতত্ত্বকে বিস্মৃত হয়ে আচার অনুষ্ঠানের ওপরই দেওয়া হতে থাকে গুরুত্ব। ফলে ধর্ম হারায় উদারতা। মানুষও হয়ে উঠতে থাকে কূপমণ্ডুক।

এইসময়ে শাসক ইংরেজ এদেশে শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখার স্বার্থে কেরানিগিরির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করতে থাকে।